ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

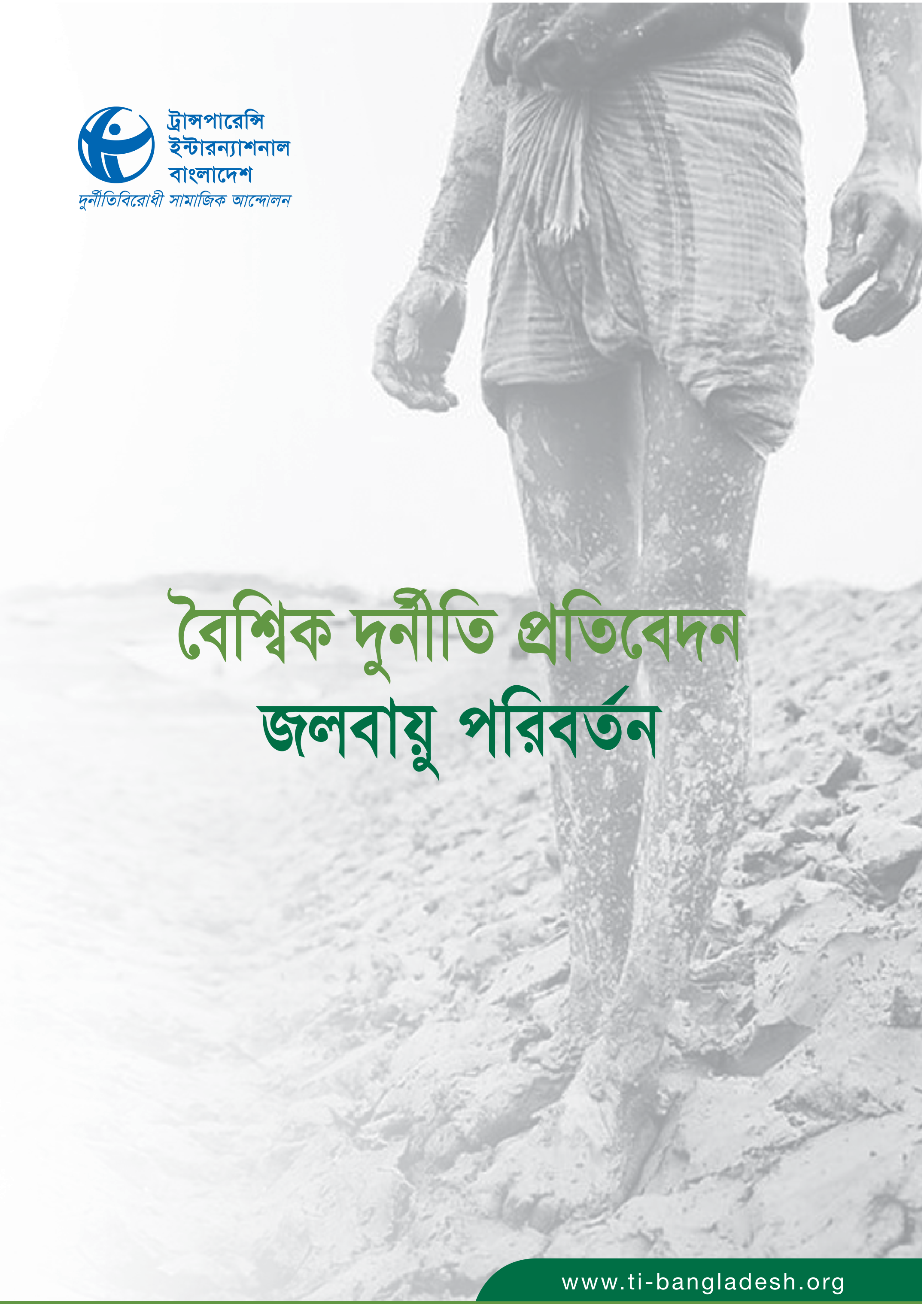

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন
জলবায়ু পরিবর্তন

www.ti-bangladesh.org

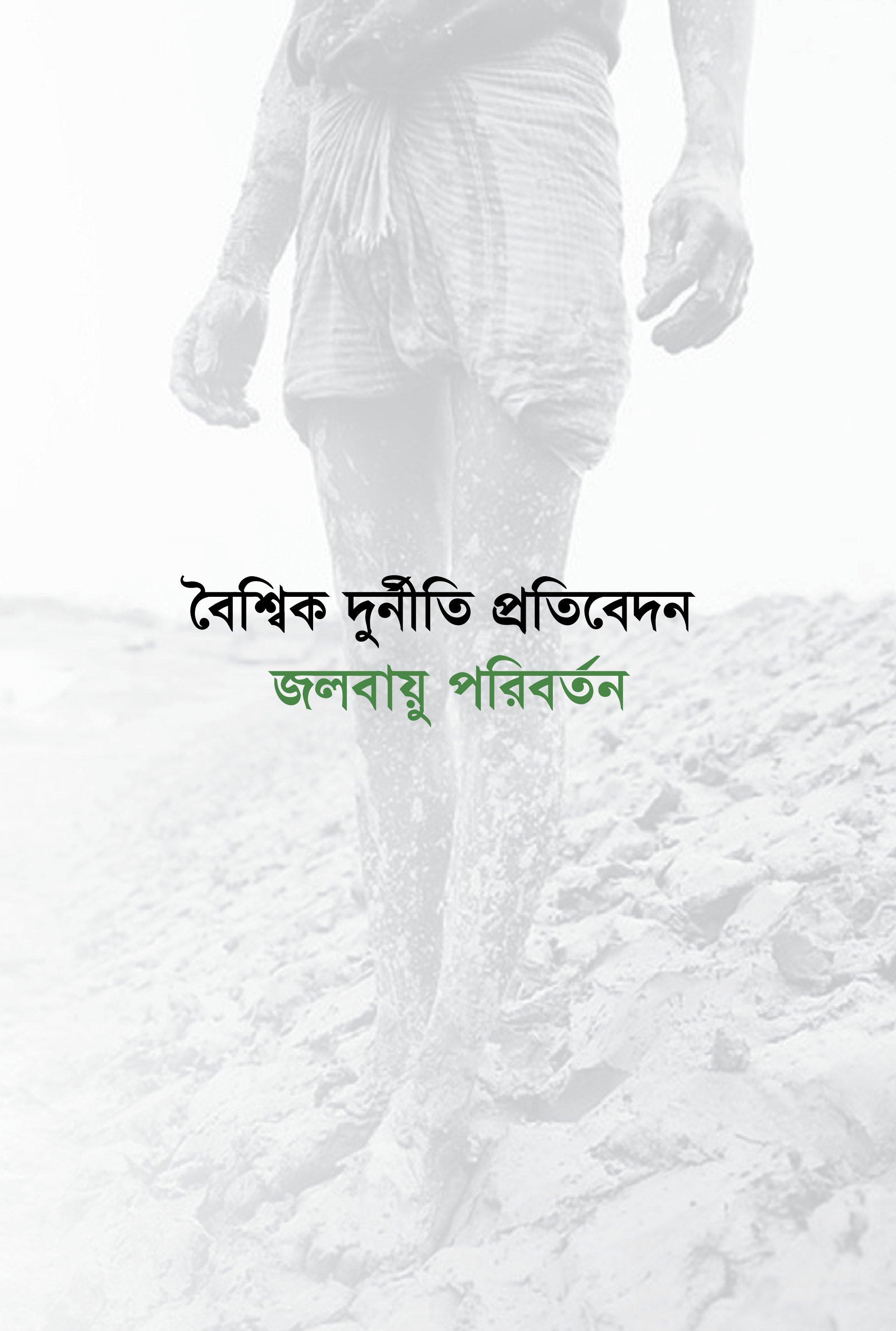

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তন

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: জলবায়ু পরিবর্তন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর অনুমতিক্রমে মূল প্রতিবেদনের ইংরেজি সার-সংক্ষেপ থেকে টিআইবি কর্তৃক অনুদিত ও প্রকাশিত।

প্রকাশ: এপ্রিল ২০১১

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

আজ আমরা পৃথিবীব্যাপী এক হুমকির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, যার নাম জলবায়ু পরিবর্তন। এই হুমকি মোকাবেলার প্রধান উপাদানই হচ্ছে সুশাসন ব্যবস্থা। সততা ও দৃঢ়তার সাথে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতির প্রয়োগের মাধ্যমেই পৃথিবীর সব মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের নিজেদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন ও সহযোগী করে তোলা যাবে।

পনের বছরেরও বেশি সময় ধরে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, প্রতিরোধহীন দুর্নীতি জীবন ও জীবিকা ধ্বংস করে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচারের প্রচেষ্টা ব্যাহত করে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই ঝুঁকি প্রযোজ্য। সুশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব, একইসাথে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সমস্ত প্রশমন এবং অভিযোজনমূলক কৌশল এবং সমাধান উঠে আসবে সেগুলোতে জবাবদিহিতা, সততা এবং অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপক ঝুঁকি এবং সময়ের অভাবের কারণেই আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, জলবায়ু পরিবর্তন নীতির গঠন এবং প্রয়োগ যেন যথাযথ, কার্যকর এবং স্বচ্ছ হয়।

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: জলবায়ু পরিবর্তন থেকে আমরা দেখতে পারি আমাদের সামনে কি বিশাল কাজ পড়ে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সব সমাধান দরিদ্র ও ধনী দেশগুলোর মধ্যে অবশ্যই যেন বিশ্বাসের ভিত্তি গড়ে তোলে। টিআই এ আমরা জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের মাধ্যমে একই ধরনের একটি কর্মসূচির প্রবর্তনে সহায়ক হয়েছি, যার মাধ্যমে আমাদের মুখোমুখি দুর্নীতির চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবেলায় সার্বিক এবং বিশ্বব্যাপী ঐকমত্য দেখতে পাওয়া যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশমন এবং অভিযোজনমূলক কার্যক্রমে শুধুমাত্র সরকারের ভূমিকাই যথেষ্ট নয়, কর্পোরেট খাতকেও এক্ষেত্রে সবুজ অর্থনীতির প্রধান আর্থিক যোগানদাতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। টিআই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে একত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের যথাযথ এবং স্বচ্ছ সমাধানের জন্য কাজ করতে উৎসাহী, যা সৎ ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার জন্য অত্যন্ত জরুরি বলে আমরা মনে করি।

সবশেষে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাটি আমাদেরকে নাগরিক সমাজ ও গবেষকদের আরও কাছে নিয়ে এসেছে। টিআই এ আমরা সেই সকল বিজ্ঞানী ও পরিবেশ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের দেখে উদ্বুদ্ধ হই যারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও এ বিষয়টি কতটা অত্যাবশ্যক তা বোঝানোর জন্য বছরের পর বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা বিশ্বাস করি, সহযোগীর ভূমিকা নিয়ে পরিবেশবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ আরও শক্তিশালী করা সম্ভব যদি এর সাথে শুধু দুর্নীতি প্রতিরোধই নয় বরং মানবাধিকার, মানবিক সহায়তা, উন্নয়ন সাহায্য এবং ভোক্তা সচেতনতামূলক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আমাদের বিভিন্ন রকম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় করলে শুধু জলবায়ু পরির্বতন সমস্যার সমাধানই নয়, আমরা আরও উন্নত সুশাসন ব্যবস্থা এবং দীর্ঘস্থায়ী, ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিত করতে পারব।

হিউগেট লাবেল
চেয়ার, আন্তর্জাতিক বোর্ড অব ডিরেক্টরস্
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

ঢাকা, ৩০ এপ্রিল ২০১১

ভূমিকা

গ্লোবাল করাপশান রিপোর্ট বা বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) এর একটি নিয়মিত গবেষণা, যার মাধ্যমে একটি নির্ধারিত খাত বা বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের সুনির্দিষ্ট গবেষণালব্ধ তথ্য, উপাত্ত, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এই প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো ছিল বেসরকারি খাত, পানি সম্পদ, বিচার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদনের বিষয় জলবায়ু পরিবর্তন - যা মানব সভ্যতার সম্মুখীন সবচেয়ে কঠিন, জটিল ও ভয়াবহ সমস্যার অন্যতম হিসেবে বিবেচিত। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জের বিস্তৃতি ও গভীরতা ব্যাপক এবং এক্ষেত্রে গবেষণা, আলোচনা, বিতর্ক ও উদ্বেগের পরিধিও অনুরূপ অপরিসীম।

জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর টিআই এর এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে টিআই দুর্নীতিবিরোধী একটি আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন হিসেবে তার স্বাভাবিক কর্ম-পরিধিতে সীমাবদ্ধ থেকে এই বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি ও সম্ভাব্য দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষতিকর প্রভাব, তার ক্ষেত্র ও প্রক্রিয়া এবং সর্বোপরি, এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততা প্রতিষ্ঠার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন যেমন একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ তেমনি এর নেতিবাচক প্রভাব প্রতিরোধে বিশেষ করে, প্রশমন এবং অভিযোজনের লক্ষ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সংকুলানের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে যে খাতে যত বেশি সম্পদ, সেই খাতে তত বেশি সুশাসনের ঘাটতি আর অনিয়ম-দুর্নীতির সম্ভাবনা। বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন জলবায়ু পরিবর্তন খাতে সুশাসনের সমস্যা ও দুর্নীতির চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার পাশাপাশি এই খাতে যে বিপুল সম্পদ ব্যয় হচ্ছে এবং হতে যাচ্ছে তা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততার সাথে ব্যবহারের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-র জন্য এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এই প্রতিবেদনের বৈশ্বিক প্রকাশনা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব যেসব দেশে সবচেয়ে বেশি পড়েছে ও পড়বে তার শীর্ষে বাংলাদেশ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের নিত্যদিনের সমস্যা। সাম্প্রতিককালে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ, অনিশ্চয়তা ও ভয়াবহতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিশেষজ্ঞগণ যুক্তিসঙ্গতভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করেন। আর এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা অধিকতর ভয়ঙ্কর রূপ গ্রহণ করে মানুষের সৃষ্ট সুশাসনের ঘাটতি, জাতীয় সততা ব্যবস্থায় দুর্বলতা, গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা ও সর্বোপরি দুর্নীতির কারণে, যার ব্যাপকতা ও গভীরতা বাংলাদেশের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে সর্বজনবিদিত।

স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হয়েছে। গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের জাতীয় আয় বেড়েছে বছরে ৫-৬ শতাংশ হারে। দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থিত মানুষের হার নেমে এসেছে ত্রিশের কোটায়; নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে। সর্বোপরি, গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় ৪০ বছরে বাংলাদেশের যা অর্জন তা পৃথিবীর অনেক দেশেই শত বছরেও সম্ভব হয়নি। তবে সুশাসনে ঘাটতি ও দুর্নীতির কারণে এই অর্জন যে শুধু ম্লানই হয়েছে তা নয়, এ কথা আজ সর্বজনবিদিত যে, বাংলাদেশ যদি দুর্নীতিকে মধ্যম পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো তাহলে আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধি আরো ত্বরান্বিত হতো।

সেবা খাতে দুর্নীতির ওপর পরিচালিত টিআইবি'র 'জাতীয় খানা জরিপ ২০১০' অনুযায়ী শুধুমাত্র সেবাগ্রহীতা পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বছরে জাতীয় আয়ের ১.৪ শতাংশ ও বাৎসরিক জাতীয় বাজেটের ৮.৪ শতাংশ ক্ষতি হচ্ছে। দুর্নীতির প্রভাব সকলের ওপর পড়ে, তবে এর ফলে সবচেয়ে ভারী বোঝাটি বইতে হয় সমাজের ক্ষমতার বলয়ের বাইরে অবস্থিত জনগোষ্ঠীকে, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগণকে।

এই প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশের জন্য অন্য যেকোন খাতের মতোই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা ও সুশাসন নিশ্চিত করা অপরিহার্য। সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন কর্ম-পরিকল্পনা (২০০৯-২০১৪) সুস্পষ্টভাবে দরিদ্র ও সবচেয়ে নাজুক অবস্থানে থাকা জনগোষ্ঠীর ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা তহবিলেরও মূল লক্ষ্য সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানের জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া। ১১ কোটি ডলারের এই তহবিলে যোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এরচেয়ে বহুগুণ বেশি সম্পদের। দ্রুত অসম্প্রসারণরত এই খাতে এরূপ বিপুল সম্পদ ব্যবহারে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা নিশ্চিত করা হবে - এটা জনগণের প্রত্যাশা।

এই বিবেচনায় টিআইবি সরকারের প্রতি আবেদন করেছে যেন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত সকল সম্পদ ব্যবহারে এমন একটি আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় যা এই খাতে সকল স্টেকহোল্ডারদের সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, তথ্য প্রকাশ, দুর্নীতিবিরোধী নীতিমালা অনুসরণে বাধ্য করবে; কারো প্রতি ভয় বা করুণা না করে এই খাতে দুর্নীতিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে; স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ করবে; এবং অংশীদারিত্ব নির্ভর ব্যবস্থাপনা সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সততা ব্যবস্থার সনাতনী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তহবিল ব্যবহার নীতিমালা প্রয়োগ, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়নসহ সকল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকারী সামাজিক দায়বদ্ধতার হাতিয়ার ও প্রক্রিয়ার ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদনের সারমর্মের এই বাংলা সংস্করণ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের, বিশেষ করে সরকার ও সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, নাগরিক সমাজ, বেসরকারি সংস্থা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও দাতা সংস্থার কাজের ক্ষেত্রে একটি সময়োপযোগী সহায়ক- এই আমাদের বিশ্বাস। ইংরেজিতে মূল প্রতিবেদনটি টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিবেদনের তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে একযোগে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশে সুশাসন নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান সুদৃঢ় করার চাহিদা সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি সংস্কার আনয়নে তার উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ঢাকা, ৩০ এপ্রিল ২০১১

প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

আজ পর্যন্ত এই পৃথিবী যত সুশাসনের সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, তার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সংকট মোকাবেলার জন্য জনগণের সম্পদ ব্যবস্থাপনাকারী সকল প্রক্রিয়া ও সংস্থার মধ্যে গতানুগতিক সম্পর্কের উর্ধ্বে গিয়ে তাদের কাজের মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয়, সংহতি, সহযোগিতা এবং দ্রুততা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প বিপ্লবের ফলে আমাদের অর্থনীতিতে যে যুগান্তকারী পরিবর্তনগুলো এসেছে, এই জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় তার অনেকগুলো থেকেই আমাদের সরে আসতে হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন মানুষের জীবন ও জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে জলবায়ু পরিবর্তন এক সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। সমগ্র বিশ্বজুড়ে এই সংকট মোকাবেলার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় মানুষের জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

এক বিশাল জলবায়ু সুশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক, জাতীয়, কর্পোরেট এবং স্থানীয় পর্যায়ের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি খাত থেকে যে বিপুল পরিমাণ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিনিয়োগ হচ্ছে, একটি ন্যায্য ও সঠিক সুশাসন ব্যবস্থাই এই বিনিয়োগের সাফল্য বয়ে আনতে পারে। এই সাফল্যের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ভবিষ্যতে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হবে এবং তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানা বাধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন কোম্পানি এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ঐকমত্যের ভিত্তিতে কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। জলবায়ুর সঠিক সুশাসন ব্যবস্থা এই কর্মসূচিকে আরও ত্বরান্বিত করবে এবং এই প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও ন্যায্য করে তোলার মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন শুধু সনাতনী শাসন ব্যবস্থার ওপরই চ্যালেঞ্জ নয়, এটি দুর্নীতি সম্পর্কিত সকল প্রচলিত প্রকারভেদকেও ছাড়িয়ে যাবে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সংজ্ঞানুযায়ী, দুর্নীতি হল ব্যক্তি স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার। ‘অর্পিত ক্ষমতা’ মানে শুধুমাত্র জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা নয়। এই অর্পিত ক্ষমতা হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই পৃথিবীকে তত্ত্বাবধানের জন্য আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে সেটা। স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার নানাভাবে হয়ে থাকে। যেমন - তহবিল আত্মসাৎ, চুক্তির উদ্দেশ্যে ঘুষ আদান-প্রদান, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি। এগুলোকে অতিক্রম করে ক্ষমতার অপব্যবহার এখন আরও বিভিন্ন নতুন নতুন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছে যেমন - বৈজ্ঞানিক তথ্যকে বিকৃত করা, ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের মূলনীতির বরখেলাপ এবং বিভিন্ন পণ্যের পরিবেশ-বান্ধবতার মিথ্যা দাবি। এ প্রতিবেদনে এই বিষয়গুলোর বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই ধরণের দুর্নীতি জলবায়ু সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে এটা আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে, কারণ এখানে অনিশ্চয়তার পরিমাণ অনেক বেশি এবং এখানে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দুর্নীতি কেন একটি বাধা? বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিহত করা এবং এর নেতিবাচক প্রভাবের প্রতিকার করা খুবই ব্যয়বহুল একটি কর্মসূচি। যখন বিপুল পরিমাণ অর্থ একটি নতুন এবং অপরীক্ষিত অর্থনৈতিক বাজারে আসে, তখন সেখানে দুর্নীতির সুযোগ সবসময়ই থেকে যায়। কারো কারো মতে, ২০২০ সালের মধ্যে শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিহত করার জন্য আনুমানিক ৭০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হবে। অপেক্ষাকৃত নতুন, সমন্বয়হীন এবং অপরীক্ষিত প্রণালীতে পরবর্তীতে প্রতি বছর সরকারি খাত থেকে ২৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হবে। উপরন্তু, জলবায়ু পরিবর্তনের দ্রুত সমাধানের যে চাহিদা ইতোমধ্যে বিদ্যমান, তার কারণে দুর্নীতির সম্ভাবনা আরও বেশি বেড়ে যায়।

জলবায়ু বিষয়ক কোন কোন ক্ষেত্রে জটিলতা, অনিশ্চয়তা এবং অভিনবত্ব থাকার কারণেও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়। এই বিষয়ক প্রয়োজনীয় ধারণাগুলো যেমন - কোনটাকে আমরা বন বলবো বা সাহায্য ছাড়া কোন কর্মসূচি সফল হবে কিনা, এগুলো নিয়ে এখনো বিতর্ক রয়েছে। আমাদের পরিবেশের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফল-প্রদায়ী ভূ-প্রকৌশল বিধিমালা এখনো কার্যত অনুপস্থিত। কার্বন নিঃসরণ কমানোর বিভিন্ন পদক্ষেপের কার্যকরতা এবং পরিবেশের ওপর এর প্রভাব - এই বিষয়গুলো এখনো অনেকাংশেই অপরীক্ষিত। এই প্রতিবেদনের সকল তথ্য প্রমাণ এটাই নির্দেশ করে যে, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থায় অনেক ফাঁক-ফোঁকর বিদ্যমান এবং এখানে দুর্নীতির অনেক সুযোগ রয়ে গিয়েছে। এই সংকটময় মুহূর্তকে নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন পদ্ধতিগুলোর সফলতা প্রয়োজন। আর সে লক্ষ্যে প্রয়োজন সতর্ক পর্যবেক্ষণ, দ্রুত শেখা এবং সক্রিয় উদ্যোগের মাধ্যমে দুর্নীতির দরজাকে বন্ধ করে দেয়া।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণের আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর কলাকৌশলের অসমতা। এই বিষয়টিতে অত্যন্ত জরুরীভিত্তিতে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। বৈশ্বিক দুর্নীতির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর মাঝে আছে উপজাতীয় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামবাসী, আশঙ্কাজনকভাবে বসবাস করছে এমন শহরবাসী এবং বাস্তুহারা জনগণ যাদের পুনর্বাসন প্রয়োজন। এই জনগোষ্ঠীগুলোর মাঝে বেশকিছু দিক থেকে মিল রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় আঘাতগুলো তাদের ওপর দিয়ে যায়। যদিও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে তাদেরই সবচেয়ে বেশি লাভবান হওয়ার কথা, অথচ তাদের মতামতই এখানে সবচেয়ে কম গুরুত্ব পায়। এর মাধ্যমেই আমরা একটি জবাবদিহিমূলক জলবায়ু সুশাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

বৈশ্বিক দুর্নীতির প্রতিবেদন এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হল জলবায়ু সুশাসন কাঠামোকে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করে তোলার মাধ্যমে দুর্নীতির ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট নীতিমালাকে আরও সফল ও কার্যকর করে তোলা সম্ভব। জলবায়ু সুশাসন ব্যবস্থায় মানের ওপর নির্ভর করবে অন্তর্নিহিত দুর্নীতি মোকাবেলার সাফল্য। আর এই জলবায়ু সুশাসন ব্যবস্থা তখনই কার্যকর হবে যখন এটি হবে অংশগ্রহণমূলক, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সাড়া-প্রদায়ী এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্নীতি সম্পর্কে প্রথমবারের মতো পঞ্চাশোর্ধ বিশেষজ্ঞের মতামত এবং সমন্বিত বিশ্লেষণ এবং বেশকিছু নীতি পরামর্শ তুলে ধরা হয়েছে।

কার্যকর জলবায়ু সুশাসন: জবাবদিহিতা ও সততার প্রক্রিয়া নির্ধারণ

জলবায়ু সংকট মোকাবেলা একটি বিশাল ও জটিল পদক্ষেপ। এর জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পরিমাণও অনেক। তাই প্রয়োজন সমন্বিত পদ্ধতি-নির্ভর ও জবাবদিহিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ক) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার গুরুত্বপূর্ণ অনেক সিদ্ধান্তই প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষিতে গৃহীত হয়, যে কারণে শুধুমাত্র কতিপয় উচ্চপর্যায়ের আন্তর্জাতিক সভায় দেয়া পরামর্শের দিকে দৃষ্টি দিলেই চলবে না।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার উচ্চপর্যায়ের আন্তঃসরকার বৈঠকের ওপর প্রাধান্যের কারণে উপনীত সিদ্ধান্তগুলো অনেক সময়ই জটিল আকার ধারণ করে। এই ক্ষেত্রটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আন্তর্জাতিক থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত বহুমুখী ফোরাম ও ব্যক্তিত্বের সম্পৃক্ততার কারণে নীতি-নির্ধারণী ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী পরিধি ও বহুমাত্রিকতা বিরাজ করে।

বিশ্বে বর্তমানে ৫০০ টিরও বেশি পরিবেশ বিষয়ক বহুপাক্ষিক চুক্তি রয়েছে। এদের মধ্যে বেশকিছু চুক্তি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। শুধুমাত্র কোপেনহেগেন বা কানকুনে সরকার প্রতিনিধিদের মাঝে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। সেজন্য আরও কিছু জাতীয় ও আঞ্চলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে, যেমন - বেইজিং, ব্রাসেলস, ব্রাসিলিয়া থেকে দিল্লী এবং ওয়াশিংটন। সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত ভূমিকা এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একইভাবে নগর ও আঞ্চলিক সরকারেরও এখানে ভূমিকা রয়েছে। এরা সবাই মিলে অঙ্গীকারের উচ্চ মাপকাঠি নির্ধারণ করতে পারে অথবা অনেক সময় অবমূল্যায়নও করতে পারে।

নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ফোরামের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাত্রায় তারতম্য হতে পারে। এই নীতিমালার উচ্চতর মান নিশ্চিত করতে হবে এবং এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার নীতি-নির্ধারণে অশুভ প্রভাবের সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। কার্যকর বৈশ্বিক পদক্ষেপ গ্রহণের পথে অনেক বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ব্যাপক বিস্তৃত এই জলবায়ু সুশাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে বহুমুখী বৈশিষ্ট্য, নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অসমতা, নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা-এগুলো প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে।

খ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার নীতি প্রক্রিয়ায় বিপুল সাড়া ও রেকর্ডসংখ্যক উপস্থিতি অনেক সময় এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে বিরাজমান বৈষম্যকে অবমূল্যায়ন করতে পারে।

উচ্চ দৃশ্যমানতা যেমন যথাযথ জাবাবদিহিতা নিশ্চিত করে না, তেমনি উচ্চ উপস্থিতিও সমপরিমাণ প্রভাব নির্দেশ করে না। জলবায়ু পরিবর্তন নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ফোরাম হচ্ছে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC). কিন্তু এই নীতিমালা অন্যান্য পরিমন্ডলে প্রচলিত মানদণ্ডের চেয়ে পিছিয়ে আছে। কোপেনহেগেন সম্মেলনে রেকর্ডসংখ্যক দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন এবং এই সম্মেলন বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তাতে এটা প্রমাণিত হয় না যে, উপস্থিত সকলের সেখানে সমান প্রতিনিধিত্বের সুযোগ ছিল। কোপেনহেগেন সম্মেলনে সবচেয়ে বেশি দূষণকারী দেশের প্রতিনিধিদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে,

তাদের প্রতিনিধিদের সংখ্যার তিন গুণ। ২০০৯ সাল নাগাদ UNFCC তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডা থেকে নিবন্ধিত পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার সংখ্যা হয়েছে ৪০০ এরও বেশি। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর মাঝ থেকে শুধুমাত্র ব্রাজিল, চীন এবং ভারত থেকেই দশের অধিক সংস্থা নিবন্ধিত হয়েছে। সর্বোপরি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জলবায়ু সুশাসনের ব্যাপারে পর্যাপ্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সকলের অভিমতের সমান প্রতিফলন ঘটাতে এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

গ) লবিংয়ের ক্ষেত্র প্রসারিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হচ্ছে, সেইসাথে অযাচিত প্রভাবের ঝুঁকি বাড়ছে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশি হারে।

অনেক পরিবেশ-বান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান এখন জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লবিং এর সাথে জড়িত হচ্ছে। এর আগে এই কাজটির সাথে মূলত জ্বালানী খাতের বিভিন্ন সংস্থা জড়িত ছিল। তাদের মূল কাজ ছিল জীবাশ্ম জ্বালানীর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা। এখন নতুন পরিবেশ-বান্ধব সংস্থাগুলোর লবিংয়ের কল্যাণে জলবায়ু সুশাসন নীতিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে সকলের সমান অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত হচ্ছে। বৈশ্বিক দুর্নীতির প্রতিবেদন অনুযায়ী এটা সর্ম্পূণ চিত্র নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুধুমাত্র তেল এবং গ্যাস খাতে ২০০৯ সালে লবিংয়ের খরচের পরিমাণ পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানী খাতে খরচের তুলনায় আট গুণ বেশি ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নে, ২০০৪ সালে জলবায়ু নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর অবদান ছিল পরিবেশ-বান্ধব সংস্থাগুলোর দ্বিগুণেরও বেশি।

শুধুমাত্র সবুজ ও বাদামী লবিংয়ের সমান উপস্থিতিই জলবায়ু নীতিমালাকে জনমুখী করতে পারবে না। প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রভাবশালী পরিবেশ-বান্ধব সংস্থাগুলোর জোরালো সমর্থনের পাশাপাশি যদি দূষণকারীকে শাস্তি দেয়া নিশ্চিত করা না যায় তবে দ্বিমুখী নীতি-দখল ঘটতে পারে। অধিকাংশ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) অন্তর্ভুক্ত দেশে তদবির করার জন্য নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পরিবেশ সংক্রান্ত জনসম্পৃক্ততার অঙ্গীকার ও কার্যাবলীর কতটুকু অংশ জনগণের কাছে উন্মুক্ত করবে ও কতটুকু গোপন রাখবে- এ বিষয়েও কোন স্বচ্ছতা নেই।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রভাবের কারণে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের নীতিমালার ফলাফল সবার জন্য ইতিবাচক নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অগ্রসরমান জলবায়ু নীতিমালার কারণে ভারত ও চীনের জ্বালানী খাতের সাথে জড়িত সংস্থাগুলোর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এই সংস্থাগুলোর অনেকেই সরকার অনুশাসিত বড় কর্পোরেশন যাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে। এসব কারণেই নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে যথাযথ সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত যাতে নীতি-দখল না ঘটে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা উচিত, যার ফলে মুষ্টিমেয় কিছু জনগোষ্ঠীর উপকার না হয়ে সমগ্র বিশ্ববাসী উপকৃত হতে পারে।

উপশম: কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের বিভিন্ন কৌশল

কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। এর মধ্যে একটি উপায় হচ্ছে সারা পৃথিবীব্যাপী গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ কমানোর ব্যবস্থা করা। আরেকটি উপায় হতে পারে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে যেমন - বনাঞ্চলে বা অন্য কোন কৃত্রিম পরিবেশে কার্বনের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ। কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের নানাবিধ উপায়ের মাঝে আছে আন্তর্জাতিক কার্বন বাজার তৈরি, নিঃসরণের সর্বজনবিদিত নীতিমালা প্রণয়ন, জ্বালানী খাতের জন্য যথাযথ কর্মসূচি কার্যকর করা এবং সর্বোপরি একটি হ্রাসকৃত কার্বনভিত্তিক অর্থনীতির দিকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে যাওয়া। যদিও এই কর্মসূচিগুলোর মধ্যে বেশকিছু এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, পর্যাপ্ত সুশাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এই কর্মসূচিগুলোকে সফল করে তোলা সম্ভব।

ক) স্বচ্ছতা ও চূড়ান্ত বিবেচনায় উপশম কৌশলের সফলতার জন্য কার্বন নিঃসরনের একটি পরিমাপন, প্রতিবেদন ও সনাক্তকরণ (এমআরভি) পদ্ধতি অপরিহার্য।

জাতীয় পর্যায়ে গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাসের ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপ, প্রতিবেদন এবং সনাক্তকরণ অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের পক্ষেও তাদের ব্যবসায়িক স্থায়ীত্বের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার পথ সুগম হয়। বর্তমানে পরিমাণ, প্রতিবেদন এবং সনাক্তকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং পদক্ষেপ আছে। কিন্তু তথ্যগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য আরও দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ জরুরি। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বা প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতার অভাবে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এছাড়াও পর্যাপ্তসংখ্যক দক্ষ পর্যালোচকদের অভাবে কার্বন নিঃসরণ সংক্রান্ত তথ্য যথাযথভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। উন্নত দেশের সাথে সাথে উন্নয়নশীল দেশেও সঠিক পরিমাণ, প্রতিবেদন এবং সনাক্তকরণের জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা জরুরি। কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবে অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান তাদের নিঃসরণের তথ্যকে অতিরঞ্জিত করে যাতে তারা ভবিষ্যতে এটাকে হ্রাসকৃত দেখাতে পারে। কার্বন নিঃসরণের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয় এমন তথ্যের ওপর ভিত্তি করলে কার্বন ক্রেডিটের অসম বণ্টনের সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস কর্মসূচির উৎসাহে ভাটা পড়তে পারে। এর ফলে কার্বন নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ হবে এবং কিছু প্রধান দূষণকারী সাময়িকভাবে লাভবান হবে কিন্তু এর মাধ্যমে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সঠিক পরিমাপ, প্রতিবেদন এবং সনাক্তকরণের গুরুত্ব শুধুমাত্র নিঃসরণ হ্রাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পরিবেশ-বান্ধব অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্যই তাদের স্বল্প-কার্বন-নির্ভরতা প্রতিষ্ঠা করাটা জরুরি। পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তির পক্ষে সরকারের সর্মথন প্রশংসনীয়, কিন্তু শিল্পের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে নিয়ন্ত্রক পর্যবেক্ষণ কঠোরতর করতে হবে। তা না হলে অর্থনৈতিক প্রণোদনার অপব্যবহার করে মুনাফার লোভে অনেক প্রকল্পের পরিচালকেরা তাদের প্রকল্পকে সমাপ্ত বলে দাবি করবে।

খ) উপশমের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে কার্বন বাজারগুলোতে দুর্নীতির ঝুঁকি প্রতিরোধক সুরক্ষা খুবই জরুরি। সেই সাথে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে তাদের স্থায়ীত্ব ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।

বিভিন্ন দেশে এবং অঞ্চলে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্বন বাজার গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে প্রধান কার্বন বাজারগুলোর সম্মিলিত মূল্য ১৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু এগুলো আবার রাজনৈতিকভাবে

সৃষ্ট এবং সরকারি অর্থায়নে তৈরি এমন একটি বাজার যেখানে ধরা বা ছোঁয়া যায় না এমন একটি পণ্যের লেনদেন হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের Emissions Trading Scheme (ETS) এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী কার্বন বাজারগুলো বিভিন্ন পক্ষের অযাচিত প্রভাব বিস্তারের একটি ক্ষেত্র এবং ETS নিজেই কার্বন অনুমতিপত্র প্রদানের সময় অতিরিক্ত বরাদ্দ মঞ্জুর করে থাকতে পারে। এর ফলে ইউরোপের চারটি সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ৬ থেকে ৮ বিলিয়ন ইউরো অনুপার্জিতভাবে লাভবান হয়েছে[১]। তাই এই বাজ ারগুলোর ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা সকলের জন্যই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এখানে নিঃসরণের অসম বণ্টন হতে পারে এবং তার ফলশ্রুতিতে কার্বন নিঃসরনের মূল্য কমে যেতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান কার্বন-সচেতন উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাজারটিই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা থাকবে।

গ) পরিবেশ-বান্ধব অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হতে পারলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ তৈরি হবে। তবে যদি এর পাশাপাশি সুশাসনের সমস্যাগুলো প্রত্যক্ষভাবে মোকাবেলা করা না যায় তবে বৈশ্বিক বৈষম্য আরো প্রকটতম ও গভীরতর হবে।

সৌরশক্তি এবং বায়ু-শক্তি হচ্ছে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর নতুন উৎস। এই জ্বালানীগুলো জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই উদ্যোগের সাফল্যের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজন। উত্তর আফ্রিকাতে সদ্য পরিচালিত একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের অন্তত ৭০ শতাংশ মনে করেন যে, এখানে দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে এবং এটা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।

একটি স্বল্প কার্বন-ভিত্তিক অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিবর্তন প্রয়োজন। এই পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এমন কিছু দেশ যেখানে সুশাসনের ঘাটতি এবং দুর্নীতির প্রকোপ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে পরিবহনের জন্য ব্যবহারযোগ্য জ্বালানীর শতকরা ১০ শতাংশই হবে পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানী। এ জন্য সম্ভাব্য ভূমি অনুসন্ধান করা হচ্ছে এমন কিছু দেশে যেখানে দুর্নীতি প্রতিরোধে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে অর্জন বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় নিম্নমানের।

ভূমি ছাড়াও অন্যান্য খনিজ সম্পদ, যেমন - লিথিয়াম (তড়িৎ-চালিত গাড়ির ব্যাটারি তৈরির ক্ষেত্রে যার চাহিদা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে), অনেক সময় এরকম দেশে পাওয়া যাচ্ছে যেখানে সুশাসনে ঘাটতি রয়েছে। এই ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো একটি স্বল্প কার্বন -নির্ভর অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য হয়ে দেখা দেবে। তাই সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃক প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত অর্থের ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু এ বিষয়টিও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিহতকরণ একটি 'সবুজ সম্পদের অভিশাপ' হিসেবে দেখা না দেয়, যার ফলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় আর অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী দেশগুলো পরিবেশ-বান্ধব অর্থনীতির সম্পদ থেকে লাভবান হয়। এক্ষেত্রে Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) এর মত বিদ্যমান মানদণ্ডগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে[২]।

জলবায়ু পরিবর্তনে কার্যকর অভিযোজন

ক) অভিযোজন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ অভিযোজন কর্মসূচি সেইসব দেশে নেয়া হবে যেখানে দুর্নীতির ঝুঁকি বেশি রয়েছে।

এই প্রকল্পগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকারের সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য এলাকাভিত্তিক মালিকানা ও যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ীত্ব প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Kyoto Protocol Adaptation Fund এর নীতিমালা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে, তা পাওয়ার জন্য জাতীয় পর্যায়ে সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই সংস্থাগুলো যাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে সেজন্য তাদের যথাযথ দক্ষতা থাকতে হবে এবং অর্থের সঠিক ব্যবহার পরিবীক্ষণ ক্ষমতাও থাকতে হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত National Adaptation Programs of Action (NAPA) অনুযায়ী প্রতিটি স্বল্পোন্নত দেশের জন্য মাত্র দুই লাখ মার্কিন ডলার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। উপরন্ত এসব দেশে সংশ্লিষ্ট খাতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে সেটা এখনও অনিশ্চিত।

এর সাথে কার্যকর জলবায়ু সুশাসন ব্যবস্থার জন্য আরও কিছু জায়গায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে যেমন - আদালত, আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং একটি সক্রিয় গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ। যেসব দেশে অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি সেসব দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ২০টি দেশের মধ্যে কোনটিরই দুর্নীতির ধারণা সূচকের প্রাপ্ত স্কোর ৩.৬ এর বেশি নয়। এই সূচক অনুযায়ী ০ হল সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ১০ হল দুর্নীতিমুক্ত অবস্থার ধারণা নির্দেশ করে। অভিযোজন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তোলাটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সেটাকে অবশ্যই সুশাসন প্রতিষ্ঠার সার্বিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

খ) অভিযোজন প্রকল্পের প্রায়োগিক পর্যায়ে সাফল্যের জন্য তত্ত্বাবধান অপরিহার্য।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকবে বড় মাপের অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন - বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা লবণাক্ততার ঝুঁকি থেকে পানীয় জলকে রক্ষা করা। উন্নয়নশীল বিশ্বে দুর্নীতির কারণে শুধুমাত্র নির্মাণ খাতেই প্রতি বছর আনুমানিক ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি সাধিত হয়। তত্ত্বাবধান ছাড়া অভিযোজনের দুই ধরনের ঝুঁকি থাকে - তহবিল অপসারণ এবং নিম্নমানের কাজ, যার ফলে জনগণ জলবায়ু পরিবর্তনের আরও ঝুঁকিপূর্ণ পরিণতির মুখোমুখি হতে পারে। ১৯৯৯ সালে তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ১১০০০ লোক মারা যায়। এর ফলে যে স্থাপনাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাদের অর্ধেকই যথাযথ নির্মাণ নীতিমালা অনুসরণ করেনি। জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের সাফল্যের জন্য কিভাবে দুর্নীতি কমিয়ে আনা যায় তার জন্য মানবিক সহায়তা ও উন্নয়ন খাত এবং Construction Sector Transparency Initiative (COST) এর মতো উদ্যোগ থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

গ) কার্যকর সমন্বয়, পারস্পরিক জবাবদিহিতা ও কার্যক্রমের স্বচ্ছতা অভিযোজন তহবিলে সুশাসন তথা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিমালায় দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাস স্থাপনে অপরিহার্য[৩]।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তহবিল বিভিন্ন খাতে ভাগ হয়ে যায়। এদের মধ্যে আছে ছয়টি দ্বিপক্ষীয় জলবায়ু

তহবিল, দুটি World Bank Climate Investment Fund, UNFCC Fund, এবং Kyoto Protocol Fund । এদের সাথে আরও আছে নতুন Green Climate। এদের সবার ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা ভিন্ন। এর ফলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাটা দুরূহ হয়ে ওঠে। কোপেহেগেন ও কানকুন সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ তহবিল বরাদ্দ দেয়ার অঙ্গীকার করেছে, তার অর্ধেকই ২০১১ সালে World Bank এর তহবিল হয়ে আসবে, যা সুশাসন নিশ্চয়তাদায়ক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণের জন্য যত তহবিল বরাদ্দ হয়, তার সঠিক ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর সাধারণ জবাবদিহিতার কাঠামোর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বর্তমানে উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য এবং শুধুমাত্র জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের মাঝে পার্থক্য করাটা কঠিন। জলবায়ুর জন্য নতুন এবং অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য যদি কিছু সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি থাকে, তাহলে অনিয়মের পরিমাপ করা এবং ঝুঁকি কমানো সহজ হবে। এর মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং জলবায়ু অভিযোজন তহবিলের কার্যকর ব্যবহারের পথ সুগম হবে। সর্বোপরি, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন, তারা উপকৃত হবে।

বনায়নের গুরুত্ব

ক) জলবায়ু নীতিমালায় বনাঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তাই বন বিভাগের দীর্ঘদিনের দুর্নীতি প্রতিরোধ করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য বনাঞ্চলের প্রশাসন ব্যবস্থা উন্নত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কাঠের ব্যাপক আন্তর্জাতিক চাহিদা, দুর্বল ভূমি মালিকানা আইন এবং ক্ষুদ্র-জাতি গোষ্ঠীর কোণঠাসা অবস্থা বনায়নে জবাবদিহিতা ও সংরক্ষণ প্রকল্প চালু করার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। প্রতিবছর ১,০০০ -২,৩০০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি কাঠ অবৈধভাবে বা সন্দেহজনকভাবে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। আইনের ফাঁক-ফোঁকর এবং দীর্ঘদিন ধরে চলমান দুর্নীতির সহায়তায় স্থানীয় প্রভাবশালীরা বনের সম্পদ ব্যবহার করে কেবল ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করে তাই নয় বরং, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও আদায় করে থাকে। REDD (Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation), যা জলবায়ু পরিবর্তনে বন নীতির একটি প্রধান আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, এর সঠিক ব্যবহারের জন্য এই বিষয়গুলোর সমাধান আগেই নিশ্চিত করা উচিত। REDD এর কার্যক্রম (যার বর্তমান তহবিল প্রায় ৩৫০ কোটি মার্কিন ডলার) এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে সামর্থ্যে যা ঘাটতি আছে তার কিছু অংশের সমাধান করা সম্ভব, কিন্তু এর মাধ্যমে সকল দুর্নীতির সমাধান করা যাবে তা ভাবা উচিত নয়।

খ) দুর্নীতির ঝুঁকি হ্রাস ও বনায়ন প্রকল্পসমূহের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করতে ব্যাপক পরিবীক্ষণ ও শক্তিশালী প্রতিবেদনের কাঠামো জরুরী।

REDD এর সকল কার্যক্রম চালু হবার সাথে সাথে এর জন্য ২,৮০০ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি তহবিল সংকুলান হওয়ার কথা। অন্যান্য প্রশমনমূলক কার্যক্রম যেমন জাতিসংঘের Clean Development Mechanism (CDM) এ যেমন দেখা গিয়েছে, অনুপযুক্ত প্রকল্পের অর্থনৈতিকভাবে যথার্থতা প্রদান চিহ্নিত করা, কাল্পনিক প্রকল্প খুঁজে বের করা, বাড়তি ও ভুল তথ্য এবং হিসাব গরমিলসহ কার্বন ক্রেডিট নিয়ে অন্যান্য জালিয়াতি ইত্যাদি নির্ধারণ প্রতিরোধে শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার বিকল্প নেই। বনায়নে

এই ধরনের ঝুঁকির পরিমাণ বেশি। বন বিভাগে সঠিক হিসাব নেয়া কঠিন, কারণ অনেক কার্যক্রমই দূরবর্তী এলাকায় সংঘটিত হয়ে থাকে।

বনাঞ্চলের সংরক্ষণ এবং কার্বন ক্রেডিটের সুরক্ষার অর্থ হচ্ছে REDD এর আর্থিক সুবিধা অর্জন শেষ হয়ে গেলে যেন বন পুনরায় ধ্বংস করা শুরু না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা, এবং যে এলাকায় REDD এর প্রকল্প নেই সেখানেও যেন বন ধ্বংস শুরু না হয়।

গ) বনায়ন শাসন ব্যবস্থার সাফল্য নিশ্চিতকরণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
REDD প্রকল্পের পূর্ণ সুবিধা পাওয়ার জন্য এবং বন নিধন বন্ধের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ সাহায্য যেন অন্য খাতে চলে না যায় তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় জনগণকে তাদের এলাকার বন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত করা বা অন্ততপক্ষে এই প্রক্রিয়ায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদান করা হলে বনাঞ্চলের উন্নয়ন এবং তাদের জীবিকারও উন্নয়ন হতে পারে। বনাঞ্চলের অধিবাসীরা ইতোমধ্যেই জালিয়াতির শিকার হচ্ছে কারণ কার্বন ব্রোকার এবং প্রকল্প প্রণয়নের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজসের মাধ্যমে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কার্বনের অধিকার দখল করছে। বন খাতে বর্ধিত অর্থ প্রবাহের সাথে সাথে সুষ্ঠু সমন্বয় ও কঠোর পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধির প্রয়োজন যেন অর্থ সাহায্য যে জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন তাদের হাতেই যায় কিন্তু একই সাথে যেন দুর্নীতিও বৃদ্ধি না পায়।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্নীতির কারণে পৃথিবীর বৃহত্তম উপকূলীয় বনাঞ্চল সুন্দরবন ধ্বংসের মুখোমুখি[৪]

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম নিবিড় উপকূলীয় বনাঞ্চল। সুন্দরবনে রয়েছে বাংলাদেশের মোট সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৫১ ভাগ; বনাঞ্চল থেকে মোট উপার্জনের ৪১ ভাগ আসে সুন্দরবন থেকে এবং দেশের কাঠ ও জ্বালানীর ৪৫ ভাগ সুন্দরবন সরবরাহ করে[৫]।

সুন্দরবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা থেকে জৈব প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে উপকূলীয় ভূমিক্ষয় রোধ করা এবং পলিমাটি আটকে রাখা। কোন ঘূর্ণিঝড় বা সুনামির আঘাত বনের পেছনের লোকবসতিপূর্ণ এলাকায় পৌছানোর আগেই সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের প্রাচীর ভয়াবহ সাইক্লোন বা জলোচ্ছ্বাসের শক্তির প্রায় ৩০-৪০ ভাগ শুষে নিতে পারে[৬]।

সুন্দরবন আজ শুধু জলবায়ু পরিবর্তন এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির (ধারণা করা হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৪৫ সে.মি. বাড়লে সুন্দরবনের প্রায় ৭৫ ভাগ নিমজ্জিত হবে, ১ মি. বৃদ্ধিতে সম্পূর্ণ বনই নিমজ্জিত হবে) কারণেই বিপদের সম্মুখীন নয়, এর সাথে আছে দুর্নীতির বাড়তি হুমকি।

উপকূলীয় বনাঞ্চলে বে-আইনী গাছ কাটার ঘটনা অসংখ্য, বিশেষ করে এর মূল্যবান সুন্দরী গাছ। কিছু ব্যবসায়ী, অসাধু বন কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রশাসনের যোগাসাজশে সুন্দরবনে নির্দ্বিধায় বে-আইনীভাবে গাছ কাটা হয়[৭]। সাধারণত গোলপাতা পরিবহনের নৌকায় করে এসব গাছের গুড়ি পাচার করা হয়। ধারণা করা হয় শুধু মাত্র এই ধরনের পাচারের মাধ্যমে বছরে ছয় কোটি টাকারও বেশি কাঠ উপকূলীয় বনাঞ্চল থেকে পাচার করা হয়[৮]। জেলে এবং বাওয়ালীদের মাধ্যমেও কাঠ পাচার হয়, এইভাবে বছরে প্রায় ১৩৫ কোটি টাকার কাঠ পাচার হয়[৯]।

এই অবৈধ ব্যবসা চালু রাখার জন্য স্থানীয় কর্মকর্তাদের যোগসাজশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ধারণা করা হয় যে, স্থানীয় অসাধু বন কর্মকর্তারা বাওয়ালিদের কাছ থেকে বছরে প্রায় ৬.২৫ কোটি টাকা ঘুষ নিয়ে থাকে। এই বিশাল চাহিদা পূরণ করতে তাদেরকে তাদের অনুমোদিত গোলপাতার প্রায় চার গুণ বেশি সংগ্রহ করতে হয়। একইভাবে জেলেদেরকেও প্রতিবার মাছ ধরতে যাওয়ার সময় কর্মকর্তাদেরকে বে-আইনী টোল দিতে হয়। তাদের পথের বিভিন্ন চেকপোস্টে ঘুষ দিতে হয় এবং নৌকার নতুন অনুমোদন-পত্র নিতেও ঘুষ দিতে হয়। এক হিসাবে বন কর্মকর্তারা বছরে জেলেদের কাছ থেকে প্রায় ২৩ কোটি টাকা ঘুষ নিয়ে থাকে[১০]। কর্মকর্তারা অনেক সময়ই ঘুষের বিনিময়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের অনুমোদন দেয়, যাতে পরিবেশের আরও অবক্ষয় হয়[১১]।

উপকূলীয় বনাঞ্চল কর্তৃক প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে লোকালয় রক্ষার ক্ষমতার ওপর অবৈধ বৃক্ষ নিধনের ব্যাপক প্রভাব আছে, যা কিনা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে আরও ভয়াবহ ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের সরকারি নীতিমালাই অবৈধ বৃক্ষ নিধনে উৎসাহ যুগিয়ে থাকে। বাংলাদেশে নীতিমালায় বন সংরক্ষণের চেয়ে বন থেকে উপার্জনকেই বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

প্রতি বছর একটি উপার্জন মাত্রা সরকার নির্দিষ্ট করে দেয় যা কিনা সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকে। এই উপার্জন মাত্রা ঠিক মত অর্জন করার ওপর নির্ভর করে একজন নবীন কর্মকর্তার দক্ষতা যাচাই করা হয়। এই কারণে কর্মকর্তারাও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য চাপে থাকেন এবং প্রায়ই উপার্জন বৃদ্ধির জন্য অবৈধ উপায়ের আশ্রয় নেন।

এই অবৈধ কার্যক্রমসমূহের একাংশ সরকারের উপার্জন-নির্ভর নীতিমালার কারণেই উৎসাহিত হয়। যার কারণে সুন্দরবনের অবক্ষয় আরও বাড়বে এবং এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশের সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে এর প্রভাব পড়বে। সুন্দরবনের অবক্ষয় হওয়ার সাথে সাথে এর কার্বন সঞ্চয়ী ভূমিকাও বাধাগ্রস্ত হবে এবং এর প্রভাব আবারো পড়বে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর। সুন্দরবনের ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার জৈব-প্রতিরোধক এবং পলিমাটি সংগ্রহ ও ভূমি-ক্ষয় রোধক ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে প্রায় ৩৫ লক্ষ জনগোষ্ঠীর ওপর যারা জীবিকার জন্য সুন্দরবনের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল[১২]।

সুন্দরবনের অবক্ষয়ে অবৈধ কার্যক্রম ও ভুল নীতিমালার ভূমিকা থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সুশাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে সরকারের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত বন সম্পর্কিত সকল নীতিমালায় বন থেকে উপার্জনের পরিবর্তে নবায়ন যোগ্য সংগ্রহ ও বন সংরক্ষণকে গুরুত্ব দেয়া এবং এরূপ সংরক্ষণমূলক প্রচেষ্টাকে জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মসূচির অবিভাজ্যভাবে অর্ন্তভুক্ত করা। এর সাথে সাথে বন কর্মকর্তা, পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং সীমান্তরক্ষীদের দ্বারা যথোপযুক্ত নজরদারি এবং তাদের নিজেদের জবাবদিহিতা ও ক্ষমতার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারলে সুন্দরবন দু'ধরনের প্রভাব রাখবে। একদিকে কার্বন সঞ্চয়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে সমাধান হিসেবে কাজ করবে, এবং অন্যদিকে প্রাকৃতিক জৈব-প্রতিরোধক হিসেবে অভিযোজনে একটি সুদক্ষ মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখবে, মানবিক উন্নয়নের জন্য যার গুরুত্ব জলবায়ুর পরিবর্তনের আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকবে।

টেকসই জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার জন্য কার্যক্রম

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন থেকে এটা স্পষ্ট যে জলবায়ু সম্পর্কিত সুশাসন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি- বেসরকারি সংগঠন, ব্যবসায়ী ও বিজ্ঞানীসহ সকল অংশগ্রহণকারীর নির্ভেজাল সদিচ্ছা এবং সহযোগিতা অপরিহার্য। এছাড়াও জলবায়ু নীতিমালার শুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য একটি সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ জবাবদিহিতার ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। এরূপ ব্যবস্থাপনার প্রধান উপাদানসমূহ এবং পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে:

ক) সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা ও সকলের জন্য উম্মুক্ত করে দেয়া।

কে কতখানি বিকিরণের জন্য দায়ী, কে কোন নীতিমালা গ্রহণ করছে, কোন অর্থ কোথায় এবং কেন যাচ্ছে, ভোগ করা বা বিনিয়োগের সময় কার্বন খরচের হিসাব ইত্যাদি তথ্যের ব্যাপারে এটি প্রযোজ্য। এই ধরনের তথ্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঠিক দায়িত্ব ও দায়ভার সুস্পষ্টকরণ এবং জবাবদিহিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

খ) গ্রিন হাউস গ্যাস বিকিরক দেশ, নিয়ন্ত্রক, তহবিল প্রদানকারী এবং সংশ্লিষ্ট সরকারের সামর্থ্য পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ এবং তুলনা করা।

সঠিক পরিমাপ পরিবীক্ষণ জবাবদিহিতার সুযোগ তৈরি করে, দুর্নীতি চিহ্নিত করে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সংস্কারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেয়। কিছু প্রাথমিক উদাহরণ এই প্রতিবেদনে দেয়া আছে, যেমন, কার্বন বাজারে প্রধান পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানসমূহের অপর্যাপ্ত কার্যকরতা এবং বনাঞ্চলের কার্বন বিষয়ক পরিবীক্ষণ কাঠামোর অভাব, যা থেকে এই প্রক্রিয়াগুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করা যায়।

গ) সমস্যা অনুযায়ী সকল পর্যায়ের সামর্থ্য গঠন করা।

বাস্তবায়ন বা পরিবীক্ষণ সার্মথ্য উপযুক্ত না হলে মাঠ পর্যায়ে যাচাই সময় মত হয় না বা একেবারেই হয় না, এর ফলে দুর্নীতি আরও বৃদ্ধি পায়। নির্দিষ্ট দক্ষতার চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে প্রধান বিশেষজ্ঞরা অনেক রকম দায়িত্বে জড়িত হয়ে পড়ে এবং এর ফলে স্বার্থের দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা বাড়ে। অর্থের যোগান এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামর্থ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ঘ) সততা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য জলবায়ু প্রশাসনের সাথে বিদ্যমান অবকাঠামোর সংযুক্তিকরণ।

জলবায়ু সুশাসনে শক্তিশালী জবাবদিহিতামূলক প্রক্রিয়া থাকতে হবে। এই প্রক্রিয়া জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সনদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে এক্ষেত্রে সুফল অর্জন করা সম্ভব, যার মধ্যে ন্যায়পাল উদ্যোগ থেকে শুরু করে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা পর্যাপ্ত পদ্ধতিগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। তাছাড়া সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন সামাজিক অডিট ও যৌথ পরিবীক্ষণের মতো পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে ও বড় ধরনের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হবে আমাদেরকে। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে, যেন পৃথিবী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর ন্যায্য ফলাফল লাভ করে। Global Corruption Report এর ওপর ভিত্তি করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাসমূহ রাখছে।

সরকারের জন্য প্রস্তাবনা

১. গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু নীতির পরিকল্পনা প্রণোদনার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা যেন তা স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করে এবং স্বার্থের সংঘাত কমিয়ে আনে।

সরকারের নিশ্চিত করা উচিত বেতনভুক্ত এবং কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন পেশাদার পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ দেয়া যাদের কার্বন বাজারে বা এ সংক্রান্ত উন্নয়ন কার্যক্রম বা জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ক কোন প্রকল্পে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নেই। প্রকল্প সত্যায়নকারীদের যেন প্রকল্প প্রণয়নকারী কোন প্রতিষ্ঠান থেকে নয় বরং কেন্দ্রীয় কোন তহবিল থেকে বেতন দেয়া হয় এটা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশবাদী সংগঠন এবং সরকারি পর্যবেক্ষকরা সঠিকভাবে কাজ করতে পারবেন না যদি তারা যে প্রকল্পের পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করবেন সেই একই প্রকল্পে তাদের কোন রকম স্বার্থ জড়িত থাকে। অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় আমরা দেখেছি যাচাইকারি প্রতিষ্ঠানের যদি অনাকাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক বা স্বার্থ থাকে তবে তা বাজারকে ধ্বংসের মুখোমুখি নিয়ে যেতে পারে। এই একই ঘটনার যদি পুনরাবৃত্তি কার্বন বাজারেও ঘটে তাহলে এর প্রভাবে অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটতে পারে।

২. উপশম এবং অভিযোজন সংক্রান্ত অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

UNFCC এর সদস্য রাষ্ট্র সমূহকে অবশ্যই প্রকল্প অর্থায়নের প্রতিবেদনের জন্য আদর্শ মাপকাঠি প্রস্তুত করতে হবে। পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা যথাযথ পদ্ধতিতে প্রতিবেদন দেয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রেক্ষিতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থাগুলো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে তাদের নিজ নিজ দেশে অভিযোজন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পরিকল্পনা পর্যায় থেকে তহবিল ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত এবং প্রকল্পের প্রয়োগ থেকে চূড়ান্ত মূল্যায়ন পর্যন্ত যেন স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট নীতিমালা নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রের নিশ্চিত করতে হবে যে প্রশমন এবং অভিযোজনের অর্থায়নের সাথে সাথে যেন রাষ্ট্রের পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদন সামর্থও বৃদ্ধি পায়। অভিযোজনের ক্ষেত্রে, শক্তিশালী জাতীয় ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলো যেন আন্তর্জাতিক অর্থায়নকারী সংস্থাগুলো থেকে সরাসরি তহবিল সংগ্রহ করতে পারে, যাতে করে তারা অভিযোজন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। সরকার থেকে শুরু করে জনগণ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার ওপর নজর রেখে অর্থায়নে কোন বিষয়টি গুরুত্ব পাবে সেটিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩. জাতীয় জলবায়ু নীতি এবং প্রকল্পসমূহ দক্ষতার সাথে পরিবীক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান করা।

সরকারের ভর্তুকি এবং স্বল্প-কার্বন অবকাঠামো গঠনে সহায়তা দানের সাথে সাথে জনগণের অর্থ জালিয়াতির হাত থেকে মুক্ত রাখার জন্য তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও শক্তিশালী করতে হবে, বিশেষ করে যখন অবকাঠামো গঠন কারিগরিভাবে জটিল এবং তা তৈরি করতে বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক তহবিল পরিবীক্ষণের এবং কোন প্রকল্পে দুর্নীতি হচ্ছে কিনা তা বুঝতে পারার নিজস্ব সামর্থ থাকতে হবে। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে পরিবীক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া উচিত সরকারের।

৪. দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টাগুলোকে অভিযোজন এবং প্রশমনমূলক কার্যক্রমের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা।

জলবায়ু নীতি প্রণয়নের সময়ই এর কেন্দ্রীয় কাঠামোর মধ্যে সততা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যদি সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে শেখার কিছু থেকে থাকে তা হল বাজার ধ্বসে যাওয়ার পর যখন জালিয়াতির মাধ্যমে ফুলিয়ে দেখানো সম্পদের হিসাব ফাঁস হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাসও উধাও হয়ে যায়, পর্যবেক্ষক ও নিয়ন্ত্রকদের পক্ষে তখন পরিস্থিতি সামাল দেয়া অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে যায়। এমন বিপর্যয় এড়ানোর জন্য কার্বন বাজারের পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শুরু থেকেই সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। সবুজ অর্থনীতি কিছু সামগ্রীর জন্য আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে আসবে, যেমন- বলিভিয়ার লিথিয়াম, ইন্দোনেশিয়ার জৈব-জ্বালানী এবং সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য উত্তর আফ্রিকার ভূমি। যেসকল দেশ এ থেকে লাভবান হবে তাদের কল্যাণের জন্যই আয় শুরু হওয়ার আগেই আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৫. নীতি-সমন্বয় বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান বিভাগগুলোর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন প্রসঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছানো

অসঙ্গতি, অস্পষ্টতা এবং আইনের ফাঁক-ফোকরের পাশাপাশি আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের দুর্বলতার কারণে দুর্নীতি বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি বহুমাত্রিক ও বহু বিস্তৃত সমস্যার আদর্শ উদাহরণ এবং স্বভাবতই এটি সরকারের নির্বাহী বিভাগের বিভিন্ন অংশের সাথে জড়িত; যদিও সকলের লক্ষ্যই যে এক, তা বলা যাবে না। জলবায়ু নীতিমালা এবং এর ব্যবস্থাপনা অনেক সময়ই অসঙ্গতিপূর্ণ এবং এখানে সমন্বয়ের ঘাটতি থেকে শুরু করে একেবারে আন্তঃবিভাগীয় ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে শক্তিশালী নেতৃত্ব, সুস্পষ্ট দায়িত্ব বণ্টন এবং আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও একে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে এই বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে গড়ে তোলাটাও অত্যন্ত জরুরী।

৬. প্রতিনিধিত্ব এবং জনগণের সম্পৃক্ততার জন্য শক্তিশালী একটি কর্মপ্রণালী তৈরি করতে হবে যা প্রতিনিয়ত জনগণের বাড়তি চাহিদা মেটাতে পারবে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সচেতনতা জনমনে স্থায়ী হয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে, যে পরিমাণ মনযোগ ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে তার পেছনের কারণ সহজেই বোঝা যায়, এই পরিবর্তনের সাথে সকলেরই সংযুক্তি আছে। সকলেই এখানে এই পৃথিবীর এবং পরবর্তী প্রজন্মের অভিভাবক।

UNFCC এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনে ৯০,০০০ এরও বেশি মন্তব্য এবং বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনে উপস্থিতির প্রাচুর্য পরামর্শ ও অংশগ্রহণের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিসমূহের সামর্থের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। জনগণের এই ব্যাপক উৎসাহ ও অংশগ্রহণের সুফল যদি সরকারগুলো পুরোপুরি পেতে চায় তাহলে আরো ব্যাপক শিক্ষামূলক এবং সামর্থ বৃদ্ধির কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

বেসরকারি ব্যবসা খাতের জন্য প্রস্তাবনা

৭. খোলামেলা অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে জলবায়ু নীতিতে শক্তিশালী ভূমিকা পালন; এটি কর্পোরেট নাগরিকত্বের একটি অপরিহার্য অংশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি একটি প্রতিশ্রুতি।

কার্বন ফুটপ্রিন্ট এবং কার্বন নীতি বিষয়ক তথ্য দেয়াই যথেষ্ট নয়। নিজস্ব কার্বন নিঃসরণের বাইরেও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব থেকে যায়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব স্বার্থ রক্ষায় যে পরিমাণ প্রভাব খাটাতে পারে আর কোন প্রতিষ্ঠান তা পারে না, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এ ঘটনা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। কোম্পানিগুলোকে তাদের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিগুলো অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে তারা যে সকল সংগঠনের সদস্য বা যে সকল সামাজিক আন্দোলনের অংশ তাদের প্রতি তাদের দায়িত্বও বেশি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ন্যায়সঙ্গত, দীর্ঘস্থায়ী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী নীতি কাঠামো দাবি করার ব্যাপারেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং এ কাজটি তাদেরকে উন্মুক্ত পরিবেশে ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে করতে হবে।

একবার কোম্পানিগুলো যদি জানতে পারে যে তাদের কাছ থেকে কি চাওয়া হচ্ছে, তবে তারা তাদের প্রচেষ্টার তথ্য প্রকাশ করাসহ অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাদের উৎপাদন ক্ষমতা আরো ব্যবহার করতে পারে।

৮. সবুজায়নের পথে কঠোরভাবে নিয়ম মান্য করুন, দুর্নীতিবিরোধী এবং সর্বোত্তম কর্পোরেট সুশাসন পদ্ধতি মেনে চলুন।

প্রশমন বা অভিযোজনমূলক কার্যক্রমে ব্যবসার সুযোগ, যেমন - বড় আকারের অবকাঠামো বিনির্মাণ প্রকল্প অথবা অন্যান্য সরকারি দরপত্রে অংশগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে বেসরকারি খাত দুর্নীতির বহুল পরিচিত চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হয়। এই সমস্যা মোকাবেলায় বেশকিছু হাতিয়ার এবং কার্যপ্রণালী আছে। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে যৌথ উদ্যোগ যেমন - সততা চুক্তি, EITI এবং COST এর মাধ্যমে দুর্নীতির উঁচু মাত্রার ঝুঁকির সম্ভাবনাগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব। এই সমস্ত হাতিয়ার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর আত্মস্থ করা এবং তাদের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজে প্রয়োগ করা উচিত।

অর্থ বাজারে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশমনমূলক কাজের ব্যাপক খরচের কথা চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে নতুন বাজার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সর্বোচ্চ মাত্রা যুক্ত করার উত্তম সময় এখনই।

৯. স্বচ্ছতা, কার্বন নিঃসরণ এবং সবুজ জলবায়ু কার্যক্রমের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ বিনিয়োগ করুন।

উন্নত মানের অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণের জন্য স্বচ্ছতা অপরিহার্য। বড় বড় অনেক কোম্পানি এখন কার্বন নিঃসরণের তথ্য প্রতিনিয়ত দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে তা পৌঁছানোর জন্য এই তথ্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ছাড়াও যেন অন্যরা বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সংরক্ষণ বিষয়ক প্রতিবেদনকে মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে। সবুজ কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি করার সময় এতে অভ্যন্তরীণ আচরণবিধির মত সুশাসন সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয়ও আসতে পারে। এই ধরনের প্রতিবেদনে পরিচালকদেরও সম্পৃক্ত থাকতে হবে, এই প্রতিবেদন সময়ের সাথে সাথে অগ্রগতি পরিমাপক পদ্ধতির উপযোগী হতে হবে, যে যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সে সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সুলভ এবং বোধগম্য হতে হবে এবং স্বাধীন সাব্যস্তকরণ প্রক্রিয়া থাকতে হবে।

সঠিক এবং জনগণের জন্য সুলভ ও বোধগম্য প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যেন বাজারজাতকরণের কৌশলের অপব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতন গ্রাহকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পণ্যেরও 'সবুজায়ন' করা না হয়। জীবনযাপন পদ্ধতি পরিবর্তন এবং ভোক্তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ জলবায়ু বিপর্যয় এড়ানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল কোম্পানি জলবায়ুর ওপর তাদের পণ্যের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য ভুলভাবে উপস্থাপন করে তারা তথ্য প্রবাহের গুরুতর ক্ষতিসাধন, জলবায়ু-বান্ধব অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাওয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং সর্বোপরি গ্রাহকের বিশ্বাস নষ্ট করে।

সুশীল সমাজের জন্য প্রস্তাবনা

১০. জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সুশাসন প্রশ্নে স্বাধীন নজরদারি এবং পরিবীক্ষণমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া।

কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকরণে কোন দেশের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিমাপের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা রয়েছে। পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের মান এবং জলবায়ু সংক্রান্ত তহবিলের বিতরণ এবং জলবায়ু তহবিলের বিতরণের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন হাতিয়ার এবং সূচককে মূল্যায়ন যাচাই মানদণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করে এই ভূমিকাকে আরো শক্তিশালী করা সম্ভব, বিশেষ করে 'উন্মুক্ত বাজেট'-ও সরকারি খাতে স্বচ্ছতার অনুরূপ হাতিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে অধিকতর কার্যকরতার সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন সম্ভব।

১১. স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নীতি নির্ধারণে এবং নজরদারিতে জনগণের অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা ।

জাতীয় নীতি নির্ধারণ এবং স্থানীয় প্রকল্পসমূহ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে সুশীল সমাজকে একটি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে হবে। সুশীল সমাজ কর্তৃক আন্তর্জাতিক উদ্যোগে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং REDD এর ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে স্থানীয় জনগণ যেন তাদের কার্বন অধিকার সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের সম্পদের ব্যবহার অধিকার নিশ্চিত করতে পারে।

জলবায়ু সুশাসনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণে সুশীল সমাজকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে, এতে করে সবচেয়ে প্রান্তিক গোষ্ঠীর মতামত কিছুটা হলেও জানা যাবে। এছাড়াও সুশীল সমাজকে বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত নেয়ার পদ্ধতিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য অ্যাডভোকেসি করতে হবে। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে সুশীল সমাজের উচিত প্রশমন, অভিযোজন এবং অন্যান্য REDD প্রকল্প বিষয়ক জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করা।

১২. জলবায়ু ব্যবস্থাপনায় সততা বৃদ্ধির জন্য আরও বিস্তৃত জোট গঠন করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যেন সকল অংশগ্রহণকারীর স্বার্থ সঠিকভাবে বিবেচিত ও প্রতিফলিত হচ্ছে ।

অন্য যে কোন বৈশ্বিক সর্বজনীন নীতির চেয়ে জলবায়ু প্রশ্নে সুশীল সমাজ সম্ভবত অনেক বেশি সমন্বিত এবং উৎকর্ষিত, তবে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজ আরও বেশি কার্যকর হবে যদি তারা তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার, পরিবেশের থেকে উন্নয়ন, মানবিক সহায়তা এবং মানবাধিকার থেকে শুরু করে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি একত্রে সমন্বয় করতে পারে। পরিবেশবাদী এনজিওগুলোর নেতৃত্বে, সুশীল সমাজের জোটগুলো এর মধ্যেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এর উপস্থিতি ও কার্যকরতা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন এনজিও-কে একইসাথে, একই পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজে দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আশা করা যায় যে বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন এই জরুরী বিষয়টিতে এনজিওগুলোর মাঝে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে বৃহত্তর অবদান রাখবে।

তথ্যসূত্র

[১] রিচার্ড বলড্উইন, রেগুলেশন লাইট : দ্যা রাইজ অব ইমিশনস ট্রেডিং, ল', সোসাইটি অ্যান্ড ইকোনমি ওয়ার্কিং পেপার নং-৩/২০০৮ (লন্ডন: লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস, ২০০৮)

[২] দেখুন , http//:eiti.org/

[৩] দেখুন,www.constructiontransparency.org

[৪] ইফতেখারুজ্জামান ও মনজুর-ই-খুদা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

[৫] সাইদুর রহমান কর্তৃক উদ্ধৃত (তারিখবিহীন) ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (FAO) কর্তৃক প্রকাশিত 'ইকোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অব সুন্দরবন: আ রিচ বায়োডাইভার্সিটি অব দ্যা ওয়ার্ল্ডস লারজেস্ট ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম'

[৬] ডেইলি স্টার (বাংলাদেশ), ২৮ ডিসেম্বর ২০০৭

[৭] টিআই বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত ডায়াগনস্টিক স্টাডি 'ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিবিলিটি ইন ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট: প্রবলেমস অ্যান্ড ওয়ে আউট' (ঢাকা: টিআই বাংলাদেশ, ২০০৮) থেকে অংশটি নেয়া হয়েছে।
দেখুন www.ti-bangladesh.org/research/Eng-ex-summary-forest.pdf.

[৮] প্রাগুক্ত. মার্কিন ডলার ১=৬৮ টাকা (প্রায়)

[৯] প্রাগুক্ত.

[১০] প্রাগুক্ত.

[১১] প্রাগুক্ত.

[১২] দেখুন, www.unnayan.org/env.unit/paper3.pdf.

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
একটি স্বাধীন, দলীয় রাজনীতিমুক্ত এবং
অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।
বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টার
হিসেবে টিআইবি কাজ করছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে
সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও
সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত।

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাড়ি-১৪১, সড়ক -১২, ব্লক-ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩

ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১

ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

ISBN: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৩৪৩২-৯